বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম, এ।

মূল্য ৵০ আনা।

PUBLISHED BY
BABU BENIMADHAB ROY
55, COLOOTOLA STREET.

বাঙ্গালা কবিতার ভাষা ও ভাব।

বিগত কার্ত্তিকমাসের "প্রবাসীতে" বাবু দ্বিজেন্দ্র লাল রায় "কাব্যের অভিব্যক্তি" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রাবণের "বঙ্গদর্শনে" কোন লেখক "কাব্যের প্রকাশ" নামক প্রবন্ধে অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রবাবুকে বাঙ্গালার অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী বলিয়াছেন এবং তাঁহার "সোনারতরী" নামক ক্ষুদ্র কবিতার অতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা যদি যথার্থ ও প্রমাদশূন্য হইত তাহা হইলে কাহারো কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রবন্ধটি পড়িয়াই মনে হয় স্পষ্ট কাব্যের সমর্থন উপলক্ষ মাত্র; প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য রবি বাবুকে উপহাসাস্পদ করিয়া তাঁহার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে গালিবর্ষণ করা। দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজে কবি এবং সুলেখক, তাঁহার এ কাজটি আদৌভাল হয় নাই। ইহা কবিজনোচিত নহে এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুরও উপযুক্ত নহে। তিনি কবিসমাজে নিজের উচ্চাসনের কথা হঠাৎ ভুলিয়া গিয়া সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং অযথা বাংলার

একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন। শুধু সমালোচক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই; রবিবাবুর ক্ষুদ্র কবিতাটির বর্ণনার ভুল, কথার মানের ভুল, প্রভৃতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়া ইহার একটি Annotated Edition লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমি "বঙ্গদর্শনের" এবং "প্রবাসীর" একজন পাঠক। এই "কবির লড়াই" আমার নিকট নিতান্তঅপ্রীতিকর বোধ হইল। বোধ হয় "প্রবাসীর" অধিকাংশ পাঠকই আমার সহিত একমত হইবেন। এজন্য এক্ষেত্রে আমার কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু হঠাৎ এত চটিলেন কেন বলিতে পারি না। বোধ হয় কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ চটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফল্গুর অন্তঃসলিলে কিরূপ খরস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমরা জানি না। আমরা বাহিরের লোক জানিবার দরকারও নাই। তবে তিনি অত্যন্ত চটিয়াছেন নিশ্চয়। এরূপ ক্ষেত্রে অত্যন্ত চটিলে যাহা হয় (অর্থাৎ ক্রোধ নিষ্ফল হয় এবং নিজের ক্ষতি হয়) তাহাই হইয়াছে। যাঁহাকে রাগের মাথায় আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার কোনই ক্ষতি হইবে না এবং লোকে অন্ততঃ বলিবে দ্বিজেন্দ্রবাবুর কাজটি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উপযুক্ত হয় নাই।

"কাব্যের প্রকাশ" প্রবন্ধ কে লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। তিনি যিনিই হউন না কেন তাঁহার লেখায় বুদ্ধিমত্তার

বিশেষ পরিচয় দেখিলাম না। তিনি অতি অস্পষ্ট ভাবে অস্পষ্ট ভাষায় অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন করিয়াছেন। "অস্পষ্ট কাব্য" হয় না। সোণার পাথরের বাটী হয় না। তিনি বলেন, তাঁহার মাথায় "আইডিয়া" ঢোকে, অনেক কালের জমাট বাঁধা idea হঠাৎ একদিন তাঁহার কবিতার নেশায় বাহির হইয়া পড়ে। তিনি কি কাব্য লিখেন অনেক সময় নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন না। এইরূপ কবিতা অতি উচ্চদরের এবং ইহা miraculous। Fudge! যদি ideaটাই কেহ বুঝিতে পারিল না, কাহারও কোন উপকারে আসিল না তবে সে ideaর কপালে ছাই, তাহাকে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলেই ভাল হয়। এই লেখক আবার জাঁক করিয়া বলেন "আমার ভাবের যে অস্পষ্টতা, তাহা যদি কেহ কল্পনার আলোকে স্পষ্ট করিয়া লইতে পারেন তবেই পারিলেন নচেৎ আমার কাব্য তাঁহার নিকটে চিরদিনের মত রুদ্ধ রহিল"। এইরূপ কবির কাব্য বুঝিতে পারিল না বলিয়া, পাঠকের ত আর ঘুম হইবে না, বাসায় গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিবে! লেখক বাস্তবিক "কাব্যের প্রকাশ" না লিখিয়া "পদ্যের প্রকাশ" লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন, "অনেকেই সাদা কথায় ছন্দঃ মিলাইয়া মিলাইয়া বয়ন করেন, ইহাঁদের 'বর্ণিমে' খুব চমৎকার। কিন্তু পৃথিবীতে ইহাঁদিগের স্পষ্টতা সত্ত্বেও কেহই ইঁহাদিগকে আজও বড় বলিল না"। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই শেষোক্ত ব্যঙ্গেই বোধ হয় ভারি

চটীয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে একজন স্পষ্ট কবি। স্পষ্ট কবির নিন্দা তাঁহার সহ্য হইল না; একটা তীব্র প্রত্যুত্তর দিলেন। সহজ প্রত্যুত্তরে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। তিনি যদি সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন স্পষ্ট কবিই কবি তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না। তিনি অকারণ রবিবাবুকে টানিয়া আনিয়া ব্যাপারটা Personal করিয়া ফেলিলেন। শুধু তাহাই নহে রবিবাবুর "সোণার তরী" টিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে রবিবাবুর কবিতা কিছুই নহে ইহা অর্থশূন্য ও স্ববিরোধী। এইটিই হইয়াছে অত্যন্ত দোষের। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সাধারণ কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার conclusions ঠিক কিন্তু তাঁহার প্রমাণ প্রয়োগের method অত্যন্ত দূষণীয় এবং প্রমাদপূর্ণ। আর রাগের মাথায় একটা ছোট কবিতার ভুল ধরিতে গিয়া নিজে অনেক বড় বড় ভুল করিয়াছেন। সেইগুলিই আমরা একটি একটি করিয়া দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যাক্। দ্বিজেন্দ্র বাবু বোধ হয় ধরিয়া লইয়াছেন "কাব্যের প্রকাশ" প্রবন্ধ হয় রবিবাবুর লেখা না হয় তাঁহার ইসারা মত তাঁহার কোন ভক্তের লেখা। অন্ততঃ তাঁহার মতে এটি রবীন্দ্র বাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। দ্বিজেন্দ্র বাবু এ কথার কোন প্রকার প্রমাণ দেন নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। আর আসল মতের

প্রতিবাদ না হইয়া "মতের প্রতিধ্বনির" প্রতিবাদ হয় কেন? একটা অপকৃষ্ট মত রবিবাবুর বলিয়া প্রকাশ করিলে তাহার উপযুক্ত প্রমাণের আবশ্যক। সেরূপ প্রমাণের অভাব। পক্ষান্তরে এইমত যে রবিবাবুর নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য লিখিত মতই ধর্ত্তব্য। রবিবাবু কোন লেখায় "কাব্যের প্রকাশ" লেখকের মতে একমত হইয়াছেন এ কথা আমরা জানি না। রবিবাবু "মেঘনাদবধ কাব্য" নামক একটি ছোট প্রবন্ধে এক জায়গায় বলিয়াছেন "একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে?" "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" নামক লেখায় রবিবাবু বলিয়াছেন, "সহজ ভাষার সহজ ভাবের সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়"। আর এক জায়গায় বলিয়াছেন "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি"। রবিবাবু একথাও বলেন যে সহজ কথায় বড় বড় কবিরা কখন কখন অনেক অধিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন সেই জন্য তাঁহাদের সহজ কথা মাঝে মাঝে নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্র বাবুও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "শেলি ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ অনেক সময় অনেক খানি ভাব অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক স্থলে ভাব ঘনীভূত

হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে ; কোন কোন ভাব এত বেশী ঘনীভূত হইয়াছে, যে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে ও সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে।” ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কাব্যের ভাষা ও ভাব লইয়া রবিবাবুর ও দ্বিজেন্দ্রবাবুর বিশেষ মতভেদ নাই। কেবল দ্বিজেন্দ্র বাবুর বুঝিবার ভুল। তিনি কল্পনায় অসুর সৃষ্টি করিয়াছেন। মোহিত বাবু সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি কবিতায় রবিবাবু এইরূপ বলিয়াছেন ;

“কতজন মোরে ডাকিয়া কয়েছে
যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে কিছু কি ?
তখন কি কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি “অর্থ কি জানি”।
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে মুচুকি।”

এই ক্ষুদ্র কবিতাতে কবির নিজ অভীষ্টদেবতার প্রতি আত্মনিবেদন আছে। বোধ হয় যাঁহারা তাঁহার কবিতার তত সমাদর করেন না তাঁহাদের প্রতি উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক একটি প্রত্যুত্তর এই কবিতাতে আছে। রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থে ভূরি ভূরি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি “বঙ্গদর্শনের” প্রবন্ধ লেখকের মত কখন সমর্থন করেন নাই। তিনি রাশি রাশি কবিতা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই উচ্চদরের ও সহজ সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত। তাঁহার প্রথম বয়সের কবিতাবলী, ভানুসিংহের পদাবলী, লোকালয় প্রভৃতি এবং বর্ত্তমান

সময়ের কবিতাবলী ইহার প্রমাণ। তাঁহার সব কবিতা যে সমানভাবের হইবে ইহা আশা করা অন্যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে "রবিবাবু অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থক" এটা নিতান্তই ভ্রান্তমত। তবে প্রত্যেক প্রতিভাশালী কবির মধ্যে একটু miraculous ভাব আছে। রবিবাবুর "লোকালয়" নামক কাব্যের প্রারম্ভে এক জায়গায় আছে ;

"হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই।"

এখানেও বোধ হয় একটু miraculousএর গন্ধ আছে। কিন্তু এ কথাটা বাস্তবিক সত্য যে ভগবান্ এক একজনকে এক একটি missionএ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন তাঁহাদের ভিতরে একটা Divine spark আছে। Genius is conscious। তাঁহার ভিতরে একটা কিছু আছে যাহা অন্যেতে নাই। Geniusএর capacity for taking infinite pains আছে কিন্তু কেবলমাত্র যাঁহার Capacity for taking infinite pains আছে তিনিই Genius নহেন। তাহার উপরে আরো একটা কিছু আছে। কবি Gray কয়েক বৎসর ধরিয়া ঘসিয়া মাজিয়া Elegy লিখিয়াছেন। সকল কবিকেই Grayএর পথ অবলম্বন

করিতে হইবে এমন নহে। আর Gray একটা মস্ত প্রতিভাশালী কবিও নহেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু উপরোক্ত ভ্রান্তমতের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বড়রকমের ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন। দুইটিই এক শ্রেণীর। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন "আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এই উক্তিরও কোন মূল নাই এবং ইহাও কবি সুলভ কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রবন্ধমধ্যে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই। প্রথম দেখান চাই কাহারা অস্পষ্ট কবি এবং তাহার পর দেখাইতে হইবে বাস্তবিক রবিবাবু তাঁহাদের অগ্রণী কিনা। গায়ের জোরে অন্ধকারে ঢিল মারিলে কোন ফল নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি রবিবাবু নিজে আদৌ অস্পষ্ট কবি নহেন।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর একটা ভ্রান্তমত "রবিবাবুর ভক্তগণ, রবিবাবুর "সোণার তরী"কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন"। এটাও একটা মনগড়া কথা এবং কাহারা রবিবাবুর ভক্তগণ তাহার নির্দ্দেশ নাই। কয়েকটা সভায় "সোণার তরী"র আবৃত্তি হওয়াতে তাহার শীর্ষে স্থান ইহা প্রমাণিত হইল না। রবিবাবু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক কবি। যাহারা তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিতে প্রস্তুত তাহারা তাঁহার যে কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে। যাহাদের যেরূপ রুচি বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা তদনুযায়ী একটা কবিতা

আবৃত্তি করিবার জন্য বাছিয়া লইবে। যে কবিতা ছোট বা সহজবোধ্য এবং শুনিতে সুমিষ্ট প্রায় এইরূপ কবিতাই আবৃত্তির জন্য বাছা হইয়া থাকে। কোন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতাই যে আবৃত্তির জন্য নির্ব্বাচিত হয় এরূপ সব সময় ঘটে না। কোন একজন সমালোচক "সোণার তরী" পড়িয়া লিখিয়াছিলেন "তাঁহার সোণার লেখনী অক্ষয় হউক"। ইহাও ঐ কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নহে। সমালোচক কত রকমের আছে। ফোর্থ ক্ল্যাস্ পড়া বালকও কখন কখন সমালোচকের টুপি মাথায় দিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের বাজারে বাহির হইয়া থাকে। তার পর আজ কাল যে কোন লোক একখানা বই লিখিলেই অধিকাংশ সমালোচকের মতে তিনি অক্ষয় সোণার লেখনীর অধিকারী হইয়া থাকেন। রবিবাবুর ত কথাই নাই। রবিবাবু যদি নিজে বলেন তাঁহার "সোণার তরী" তাঁহার অন্যান্য কবিতার শীর্ষস্থানে তাহা হইলেও লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না। পিতামাতার যেমন অনেক সময়ে দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি অত্যাদর ও মমতা হয় কবিদেরও কখন কখন তাঁহাদের একটা যেমন তেমন কবিতার উপর সস্নেহ দৃষ্টি পড়ে।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু "সোণার তরী"র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহার কথার মানে করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই কবিতাটী অর্থশূন্য এবং স্ববিরোধী। তিনি অত্যন্ত Perjudiced হইয়া লিখিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বাস্তবিক কবিতাটী রবিবাবুর অন্যান্য কবিতার প্রায় শীর্ষস্থানীয় না হইলেও ইহা একটী উৎকৃষ্ট ভাবময় কবিতা। দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন কারণবশতঃ হঠাৎ Prejudiceএর বশবর্ত্তী হইয়া এমন সকল ভুল ব্যাখ্যা ও মানে করিয়াছেন যাহা তাঁহার মত লোকের আদৌ করা উচিত ছিল না। সেইগুলিই আমরা ক্রমশঃ দেখাইয়া দিতেছি।

দ্বিজেন্দ্রবাবু "সোণার তরী"র গদ্যার্থ ও পদ্যার্থ বাহির করিয়াছেন। কোন কবিতার গদ্যার্থ ও পদ্যার্থ বলিয়া দুটা অর্থ আছে এরূপ সকলের প্রতীতি হইবে না। তবে তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে কবিতা রূপক হইলে তাহার একটা সোজা গল্পের মানে এবং তাহার রূপক ভাঙ্গিয়া অপর একটা অর্থ অথবা আধ্যাত্মিক অর্থ হইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন এই কবিতা-টীর গদ্যার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, কারণ কোন কৃষক রাশি রাশি ধান কাটিয়া কূলে নির্ভরসা হইয়া বসিয়া থাকে না; সে ধান সে বাড়ী লইয়া যায় এবং ধান কাটিয়া গৃহে না লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্র-গণকে বঞ্চিত করিয়া, এক "যেন মনে হয় চিনি" মাঝির সহিত পলাইয়া যাইতে চাহে না। বেশ ভাল কথা। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অনেক সময়ে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস পড়িবার সময় গল্পে পাওয়া যায় নায়ক অথবা গল্পের অন্য কোন ব্যক্তি খুব ঝড় বৃষ্টির সময় অশ্বারোহণে বা পদব্রজে প্রান্তর বা কোন পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। এখানে বোধ হয়

দ্বিজেন্দ্রবাবুর যুক্তি অনুসারে বলা যাইতে পারে গল্পাংশটা ভারি অস্বাভাবিক। ঝড় ও বৃষ্টির সময় কেহ পথে বাহির হয় না, সকলে দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতরে থাকে। অতএব এরূপ উপন্যাস অস্বাভাবিক এবং পড়িবার অযোগ্য। একটু ভাবিয়া দেখিলে যাহা হঠাৎ অস্বাভাবিক মনে হয় তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। তাহার উপর আবার ভিন্ন রুচি আছে। দ্বিজেন্দ্রবাবুর একখানি নাটকে এক রাজপুত্র তাঁহার আপনার ভগিনীকে বলিতেছেন, "তুই যদি আমার স্ত্রী হতিস্ তাহ'লে বোধ হয় মাথায় চড়্‌তিস্।" ইনি আর এক জায়গায় বলিতেছেন "দেখ্ তোরা আমার দুই বোন্, আর আমি তোদের ভাই। কিন্তু রোজ রোজ আমার সাম্‌নে এমনি ঝগড়া করিস্ যেন আমি তোদের স্বামী আর তোরা দুই সতীন"। এই নাটকেই আর এক জায়গায় আছে আকবর কন্যা হঠাৎ সন্ধ্যায় এক অপরিচিত রাজপুত বীরের শিবিরে উপস্থিত এবং এ কথা সে কথার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কি বিবাহিত?" অনেকের কাছে এগুলি তত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। এই অস্বাভাবিকতার আপত্তি গোড়ায় তুলিলেই সব গোল চুকিয়া যাইত। তরী সোণার হয় না, কাঠের বা লোহার হইয়া থাকে। দুনিয়ার মধ্যে কাহারও বোধ হয় সোণার তরী নাই। কাজে কাজে "সোনার তরী" কবিতা হইতে পারে না এ কথা বলিলেই বহুপূর্ব্বে সোনার তরী ডুবিয়া যাইত!

এই বার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইহার জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবু রবিবাবুর অনেক ভক্তের নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহারা "এ্যা—ও—কি জানি" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়াছেন। পরিশেষে একজন ভক্ত তাঁহাকে একটা লাগশৈ ব্যা'খ্যা দিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে এই ভক্তগণ কাহারা। যাঁহারা ভক্তির পাত্র কবির কবিতার মানে জানেন না তাঁহারা কি রকম ভক্ত এবং তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত দূর বলিতে পারি না। ভক্ত অনেক রকম হইতে পারে। কবির গাড়ু গামছা বওয়া ভৃত্য, পাচক নাপিত ইহারাও কবির ভক্ত হইতে পারে। তাহারাও হয় ত বলে "বাহো বা আমাদের বাবু ইনি কেমন কবিতা লেখেন!" ভক্তের পরিচয় না পাইলে তাহাদের "এঁ্যা ওঁ" ব্যাখ্যা লাগশৈ বোধ হয় না। আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর এই ভক্তেদের বাড়ী হাঁটা হাঁটী করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। সোনারতরীর উপর একটা প্রবন্ধ না হয় নাই হইত। আর দ্বিজেন্দ্রবাবু নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরেও ত একটা লাগশৈ ব্যাখ্যা খাড়া করিতে পারিতেন। মন্ষ্যে Prejudiced হইলে সোজা পথে চলিতে চায় না।

এক্ষণে রবিবাবুর তথা কথিত ভক্তের লাগশৈ ব্যাখ্যাটা একবার বিচার করা যাক্। দিজেন্দ্র বাবু এই ব্যাখ্যা যেরূপ দিয়াছেন তাহা এই : "কবি তাঁহার জীবনের সঞ্চিত ধন তাঁহার জীবনদেবতার পদে সমর্পণ করিলেন? পরে নিজের জন্য কিছু

চাহিলেন। জীবনদেবতা তাঁহার ধনরাশির অর্থাৎ পরিশ্রমের ফল লইলেন, পুরস্কার দিলেন না। অর্থাৎ সকলেরই নিজের কর্ম্ম দেবতার চরণে অর্পণ করিবার অধিকার আছে; পুরস্কারে তাঁহার কোন দাবী নাই। ব্যাখ্যাটীবেশ আধ্যাত্মিক। ইহা ভগবদ্গীতার কথা। কিন্তু কবিতা হইতে কি এই অর্থ দাঁড়ায়?" দ্বিজেন্দ্রবাবু এই ভক্ত মহাশয়ের নাম দেন নাই। আমরা ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। এই মনগড়া ব্যাখ্যার ভুল ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন "যিনি আমার দেবতা তিনি এই মাঝির মত কোথা হইতে আসিয়া ভাসিয়া বিদেশে চলিয়া যান না, যাঁহাকে 'যেন মনে হয় চিনি' তাঁহাকে কেহই সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে বলেন, "আর আমাকে লহ" ইহার অর্থ কি সত্যই এই দাঁড়ায় যে "আমাকে কিছু দাও?" বড়ই দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর ন্যায় পণ্ডিতলোক এইরূপ অর্থশূন্য আপত্তি তুলিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু কি কখন "ভবনদীর কাণ্ডারী"র কথা শোনেন নাই। "ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" এই শ্লোক চরণও কি কখন তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই? "শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা"র কথা কি খুব উচ্চদরের নহে? ভগবান্‌কে কি বলা যায় না "যেন মনে হয় চিনি"। দ্বিজেন্দ্র বাবু ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের যে সুবিখ্যাত "Ode on the Immortality of the soul"এর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও একটু "যেন চিনি মাঝির" ভাব আছে:

"Trailing clouds of glory do we come
From God who is our home."

তার পর তাঁহাকে কে বলিতেছে, "আমাকে লহ" ইহার মানে "আমায় কিছু দাও।" ভক্তের দোহাই থাকিলেও এই বিকৃত অর্থটা কল্পিত নহে কি? "আমাকে লহ" ইহার মানে যদি বাস্তবিক "আমাকে লহ" হয় তাহা হইলে ত আর বড় গোল থাকে না। "আমাকে নৌকায় তুলিয়া লহ", "আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও", "আমাকে মুক্তি দাও" এই অর্থ করিলে ত আর কল্পিত অসুরটাকে বধ করিতে হয় না। লাগশৈ ব্যাখ্যাদাতাটী ত রবিবাবুর বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইনি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই ভক্ত বা assistant। মুক্তিপ্রার্থনা সকলেই করে। দেবতা কৃষককে মুক্তি দিলেন না তাহার কারণ অত সহজে মুক্তি হয় না অথবা সে মুক্তি চাহিয়াছিল বলিয়া। একজীবনের যথাসর্ব্বস্ব দানে মুক্তি হয় না! এক আশুধান্যের জোরে বৎসর কাটে না। মুক্তি বহুসময়সাপেক্ষ এবং বহুজীবনের সর্ব্বস্বদান-সাপেক্ষ এবং তাহা চাহিবার কাহারও অধিকার নাই।

প্রত্যেক উৎকৃষ্ট রূপকময় কবিতারই যে একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকিবে এরূপও হইতে পারে না। Tennysonএর "Idylls of the king" সম্বন্ধে যাহা হইয়াছিল তাহা বলিতেছি। একজন Bishop, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "যাঁহারা আর্থারের সহচারিণী তিন রাণীকে Faith, Hope

এবং charity বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা ঠিক কি না?" কবি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "They are right and they are not right. They mean that and they do not. They are three of the noblest of women. They are also those three Graces, but they are much more. I hate to he tied down to say, '*This* means *That*', because the thought within the image is much more than any one interpretation." Tennyson তাঁহার কাব্যের নানা অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "Poetry is like shot-silk with many glancing colours. Every reader must find his own interpretation according to his ability, and according to his sympathy with the poet." দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আমি এই শেষোক্ত কথাগুলি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে বলি।

দ্বিজেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র কবিতাটির বর্ণনার ভুল ধরিয়াছেন। এইখানে ভুল ধরার চরম সীমা। তিনি বলিতেছেন "কৃষক ধান্য কাটিতেছে বর্ষাকালে, শ্রাবণ মাসে। বর্ষাকালে ধান কেহই কাটে না, বর্ষাকালে ধান্য রোপণ করে"। এই নিষেধাজ্ঞা বোধ হয় কলিকাতায় agricultural departmentএর আপিসে সোণার হরপে লেখা আছে। তার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ধানের বিভাগ করিয়া কাটিবার নিয়ম বলিয়াছেন যে, হৈমন্তিক ধান

কাটে অগ্রহায়ণ মাসে, আশুধান কাটে ভাদ্র মাসে এবং বোরো-ধান কাটে উড়িষ্যায় বৈশাখ মাসে। ইহা ছাড়া অন্য কোন মাসে ধান কাটিলে তাহা বোধ হয় exceptional instanceএর মধ্যে যাইবে। প্রথমতঃ ইহা পড়িয়া আমাদের একটু staggered হইতে হইয়াছিল। চক্ষুঃ বেশ করিয়া মুছিয়া ফের পড়িলাম দেখিলাম লেখাটা ঠিক পড়িয়াছি। শুনিয়াছি কলিকাতাবাসী কাহারো কাহারো বিশ্বাস ধানগাছে কড়িকাট হয়। ইহাঁরা যদি কেহ বলিতেন বর্ষাকালে ধান কাটে না তাহা হইলে বড় দোষের হইত না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর বিলাতী agricultural experience কি শেষকালে এই দাঁড়াইল? ধানটা কলিকাতার কাছে বিশেষ জন্মায় না। পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গেই ধানের আড়ঙ্। এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায়ই বোধ হয় শ্রাবণ মাসে আশুধান্য কাটে। আর এই শ্রাবণ মাসের ধান কাটা নিয়া অনেক মামলা মকদ্দমা হয়। এই প্রদেশের প্রত্যেক মুন্সেফ্ ও ডেপুটীবাবুদের মকদ্দমার নথী অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইবে শ্রাবণ মাসে অনেক ধান কাটা গিয়াছে। এ বৎসর এই শ্রাবণ মাসের আশুধান্য খাইয়া অনেক কৃষক দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহার উপর অন্য একজন তথাকথিত ভক্তের দোহাই দিয়া "শ্রাবণ মাস যদি বত্রিশে হয়, বলদ যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়ে" ইত্যাদি হাস্যরস অবতারণার চেষ্টা নিতান্ত অদ্ভুত রসে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়

অথবা আজকালকার যাত্রার দলে ইহার পসার হইতে পারে। তার পর দ্বিজেন্দ্রবাবু ভুল দেখাইয়াছেন "শ্রাবণ মাসে বর্ষা আসে না আষাঢ় মাসে আসে।" আষাঢ় মাসে প্রথমবর্ষার সূত্রপাত হয়। আর "বরষা" মানে কি "বৃষ্টি" হয় না? তার পর আপত্তি একখানি ছোট ক্ষেতে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান হয় না। ধানগুলি কি সবই ঐ ছোট ক্ষেত হইতে উৎপন্ন? আর ঐ ছোট ক্ষেতের ধান হইলেই বা ক্ষতি কি? গরীব কৃষকের ছোট ক্ষেতের ধানগুলিই তাহার কাছে রাশি রাশি ভারা ভারা। কৃষক বেচারার বোধ হয় Experimental farm ছিল না! তার পর ক্ষেতের "চারিদিকে বাঁকাজল করিছে খেলা" বলিয়া ক্ষেতখানি দ্বীপ। আবার দ্বীপ হইতে হইতে চর হইয়া গেল! Great wits jump! অপূর্ব্ব ভৌগোলিকতত্ত্ব! বোধ হয় চর-জমি ছাড়া আর কোথাও ক্ষেতের চারিদিকে জল কেহ কোথাও দেখে নাই! চারিদিকে জল বলিলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চারিদিকে জল বুঝিতে হইবে! হায় অন্ধ সমালোচনা! কেহ যদি বলে তাহার বাড়ীর চারিদিকে লোকের বাড়ী আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথ নাই! কবিতাতে আছে মাঝী "তরী বেয়ে" আসিতেছে, তাহার পরই আছে "ভরাপাল"। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন "ভরাপালে কেহ তরী বায় না"। দ্বিজেন্দ্রবাবু কি কখন ভরাপাল নৌকার হাল দেখেন নাই! হালটাও কি বাহিতে হয় না? এরূপ কথার

মারপেঁচ নিম্নশ্রেণীর আইনজীবিদের মুখেই শোভা পায়। তারপর দেখিতেছি কোন নৌকা পারে আসিয়া "কোন বিদেশে" যাইতে পারিবে না। কবিতাতে আছে,

"পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা"।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বড়ই অহ্লাদের সহিত বলিতেছেন মেঘে ঢাকা গ্রামে তরুচ্ছায়া হয় না। দ্বিজেন্দ্রবাবু "মসী মাখা" কথাটার তাৎপর্য্য বা সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মেঘ হইলে গাছের বাহিরে যে আলো থাকে গাছের তলায় ততখানি আলো হয় না। কোন কোন সময় মেঘ হইলে গাছের তলায় কালো অন্ধকারের মত দেখায়। প্রভাতমেঘে এখানেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। আর ছায়া কথার মানে "বর্ণ" হইতে পারে। "ছায়া সূর্য্যপ্রিয়াকান্তিঃ প্রতিবিম্বমরনাতপম্।" এপার হইতে এ মসীমাখা ছায়া না দেখা যাইবার কারণ কি জানি না। কৃষক ও কি on the *wrong* side of forty! শ্রাবণ গগনে মেঘ ঘোরে ফিরে না কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। লাঠিমটা দ্বিজেন্দ্রবাবুর। শুধু ঘোরা ফিরার ত আপত্তি দেখিনা। দ্বিজেন্দ্রবাবুর রবিবাবুর কবিতার মিলের ও ভুল ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গায়ের জোরে ভুল ধরা চলে না। রবিবাবুর জীবন ভরিয়া এত মিল

দিয়াছেন যে তাঁহার গোটাকত কবিতা গরমিল হইলেও বড় একটা যায় আসে না। বৃদ্ধ পিতামহকে গায়ত্রী শিখাইবার প্রবাদটা ও অনেকে জানেন।

রবিবাবুকে তীব্র-আক্রমণ করাই দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রধান উদ্দেশ্য। "সোনার তরী" কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি তাঁহার অসহ্য হওয়াতে অনেক দিনের চেষ্টার পর কবিতাটিকে সমালোচনার কলে ফেলিয়াছেন। কবিতাটি বোধ হয় যেমন তেমনিই রহিল। তাঁহার উদাহরণটি বড় সুনির্ব্বাচিত হয় নাই এবং রবিবাবুর প্রতি অযথা আক্রমণ ও বড় illadvised হইয়াছে। যদি রবিবাবুকে আক্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয় তিনি সোণারতরী'র পরিবর্ত্তে অন্য একটা নিকৃষ্ট কবিতা উদাহরণে তুলিতে পারিতেন। রবিবাবু এত কবিতা লিখিয়াছেন যে বিলাতী কবি Wordsworthএর মত তাঁহার কতকগুলি কবিতা খুব নীরস হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একটাকে ছিন্নভিন্ন করিলেই চুড়ান্ত সমালোচনা হইত। কিন্তু তাহা বলিয়া কি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার কিছু হানি হইত? কোন কবির প্রত্যেক কবিতাই সমান প্রতিভার পরিচায়ক হইতে পারে না। গুণের ভাগ বেশী হইলে ক্ষুদ্র দোষ প্রতিভার লাঘব করে না। একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

ভক্তের দোহাই দিয়া কবিতার ব্যাখ্যা করা দ্বিজেন্দ্র বাবুর একটি নূতন পন্থা। কোন লোককে কোন কবির ভক্ত বলিলে

কি বুঝায় ঠিক বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। কাহারো ২ দুএকজন নির্দ্দিষ্ট কবির কবিতা ভাল লাগে। তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ভক্ত বলিতে হইবে। আর ভক্ত যে কবির মনোভাব ঠিক ব্যাখ্যা করিতে পারিবে তাহারই বা নিশ্চয় কি? যাহা সুন্দর যাহা উৎকৃষ্ট প্রত্যেক সৎব্যক্তিই তাহার ভক্ত। কবি বিশেষের ভক্তামিতে বিশেষ বাহাদুরী নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু রবিবাবুর কোন কোন অন্ধ ভক্তের নিকট কবির পরিচয় লইতে গিয়া ভাল কাজ করেন নাই। ভক্ত মহাশয়েরা তাঁহাতে বড়ই ঠকাইয়াছে এবং তাঁহার নিজের সুনামের হানি করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। আর দ্বিজেন্দ্র বাবু বড় একটা etiquette বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তিনি নিজে কবি ও সুলেখক কিন্তু সমালোচক নহেন (যদিও প্রত্যেক মানুষের সমালোচক হইবার অধিকার আছে)। তাঁহার পক্ষে অপর একজন শ্রেষ্ঠ কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতার অত বড় সমালোচনা করা কবির উপযুক্ত হয় নাই। কবিতে ২ মিল থাকা চাই। কবিদের মধ্যে লড়াইএর ভাব আমাদের মত সাধারণপাঠকের নিকট বড়ই হাস্যরসময় বলিয়া বোধ হয়। আর একটা বিষয় তাঁহার ভাবা উচিত ছিল। যিনি নিজে কাচের ঘরে বাস করেন, ত্রিতল কক্ষেরদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা তাঁহার উচিত নয়। একখানি ক্ষুদ্র উপল খণ্ড তাঁহার ভঙ্গুর গৃহের যথেষ্ট সৌন্দর্য্যহানি করিতে পারে। বর্ত্তমান বাংলায় এমন কোন লেখক নাই যিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারেন আমার লেখায় ভুল নাই।

যে বই পড়িতে দেখিবে পাতায় ২ ভুল। বাঙ্গালি লেখক এমনি অসাবধান এবং বাঙ্গালা ভাষার এমনি অদৃষ্ট। হয়ত কোন কোন লোক ইহার পর দ্বিজেন্দ্র বাবুর কেতাবের ভুল ধরিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে কবির লড়াই বাঁধিবে। কবি সমাজের এরূপ ভাব কোন প্রকারই বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রবন্ধের শেষাশেষি দ্বিজেন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ উদার এবং rational হইয়াছেন। রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব", "পুরাতন ভৃত্য" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা তাঁহার নিজ স্ব" এবং "মনুষ্য হৃদয়ের কমনীয় চিত্র" বলিয়াছেন। গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল দিলে কি হইবে? এ উদার ভাবটা গোড়ায় হইলে তিনি এই প্রবন্ধ লিখিবার দায় এড়াইতে পারিতেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদের আধুনিক নব্য কবিগণ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বড় বেশী আপত্তি করিবার কিছু নাই। তবে একটা sweeping remark করা চলে না। নব্য কবিগণের মধ্যে ২।৪ জন উত্তম লেখক আছেন। নব্যদের প্রধান দোষ তাঁহারা উপযুক্ত লেখাপড়া না শিখিয়াই অনুকরণ আরম্ভ করেন। অবশ্য প্রত্যেক নবীন কবিকেই প্রথমে অনুবাদ বা অনুকরণ করিতে হইবে। পিতা মাতার কথা শুনিয়াই শিশুর বুলি ফোটে। কিন্তু যে টুকু বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে অনুকরণের দোষ এড়ান যাইতে পারে তাহা অধুনাতন কবিদের অধিকাংশের নাই। verse এবং প্রকৃত Poetry যে অনেক তফাত সে জ্ঞান অনেক বাঙ্গালী

কবির নাই। বাঙ্গালা কবিতা লেখা বড় সহজ। মিল দিয়া verse লিখিয়াই তাঁহারা মনে করেন আমরা কবি হইলাম। উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে তাঁহারা নূতন ভাব লইয়া কোন কবিতা লিখিতে পারেন না। পৃথিবীর বড় বড় কবিরা sudden prodigies নহেন। দেবী সরস্বতী নিজের বরপুত্রদের সুবিধার্থে সহজে ডুব দিয়া উঠিবার জন্য কোন পুকুর কাটাইয়া রাখেন নাই। বাঙ্গালায় নব্য কবিরা Shelly অথবা Wordsworth না পড়িয়াই অথবা পড়িয়া না বুঝিয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধে শোনা কথা শুনিয়াই মনে করেন কবিতার সহজ অর্থ না হইলেও ভাল কবিতা হইতে পারে, এবং এই ভাব হইতে যাহা খুসী তাহা লিখেন। Shelly, Wordsworth বা Tennyson এক এক জন Giant Intellect। ইহাঁদের সহিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কবির তুলনাই হয় না। ইহাঁদের এক এক জনের সমস্ত কবিতা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িতে অনেক দিন লাগে। ইহাঁদের অনুকরণ করাও অনেক সময় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ দুই ভাষা কত স্বতন্ত্র। অথচ আমাদের দেশের নব্য কবিরা কেহ Shelly হইতেছেন কেহ Ryron হইতেছেন কেহ কেহ বা Shakespeare হইবার দাবী রাখেন। ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া অর্থ ঢাকিয়া যে নব্য কবিরা পদ্য লিখেন এ কথা আমি মানি না। ইহাতে অনেক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। সেকালের সংস্কৃত কবিরা ইহার উদাহরণ। বিলাতী কবিদের মধ্যে কেবল

এক Robert Browning এর অখ্যাতি আছে যে তিনি অনেক Chinese puzzles লিখিয়াছেন। তাহা হইলেও তিনি এক জন বড় কবি এবং তাঁহাকে অনুকরণ করা নব্য বঙ্গীয় কবিদিগের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপ্যার নহে। Mathew Arnold, Clough প্রভৃতি দুএক জন ইংরাজ কবির কতক গুলি ছোট ছোট কবিতা প্রথমতঃ বুঝিতে একটু কষ্ট হয় বটে। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা জটিল নহে এবং একবার কবিতার ভাব বুঝিতে পারিলে তাহা জলের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া পড়ে। Lowel এবং Holmes প্রভৃতি ২।১ জন মার্কিণ কবি ও লেখক চেষ্টা করিয়া নিজেদের লেখা একটু দুরূহ করিয়াছেন। এটী তাঁহারা কিছু বেশী পণ্ডিত বলিয়া; তাঁহারা চেষ্টা করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন। তাঁহারাও বাঙ্গালী কবির অনুকরণের অতীত। বাঙ্গালী কবিদের চেষ্টা করিয়া লেখা দুর্ব্বোধ করিবার ক্ষমতা নাই। কবিতার ভাষ ও ভাব সহজ না হইলে কাব্য উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কেহ "নলোদয়" বা "রাঘবপাণ্ডবীয়"কে উৎকৃষ্ট কাব্য বলে না। "কিরাতার্জ্জুনীয়"ও বড় উচ্চদরের কাব্য নহে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহার সর্ব্বশীর্ষস্থান সেই মহাকবির ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল; এবং ভাব ও সেই রূপ প্রগাঢ় অথচ সহজবোধ্য। কালিদাসের ভাষার ও ভাবের এতাদৃশ গৌরব না থাকিলে তাঁহার "শকুন্তলা" পৃথিবীর মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হইত না। তবে এটুকু অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রতিভাসম্পন্ন

কবিদের একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাও আছে। সেই ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহারা নূতন নূতন ভাব পৃথিবীতে আনিয়া লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং জাতীয় মাহাত্ম্য বাড়াইয়া গিয়াছেন। এই ভাব অস্পষ্ট নহে, ইহার ভাষাও অস্পষ্ট নহে। যেমন ভাবের উপর তেমনি ভাষার উপর তাঁহাদের অতুল প্রভাব।

গাইবান্ধা, ৫ই অগ্রহায়ণ,
১৩১৩ সাল।

Printed at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.